খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং *S/73377 under WB Act XXVI of 1961*

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি দীপাঞ্জন বসু '৬৪
সাধারণ সম্পাদক রজত ঘোষ '৮৫
পত্রিকা সম্পাদক সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2014-2016

• Vol 05 • Issue 7 • 15 July 2016 • Price Rs. 2.00 •

সম্পাদকীয়

আষাঢ় মাস শেষ হতে চললো। মাঝে মাঝে বৃষ্টি, তারপর প্রখর রোদ, এরকম মেঘবৃষ্টির খেলা চলেছে। দুর্গা পুজোর প্রস্তুতি শুরু যে হয়েছে সেকথা বোঝা যায় বড় বড় দুর্গোৎসবের খুঁটিপুজোর আড়ম্বর দেখে।

অ্যাসোসিয়েশনের আগামী কোনো কার্যক্রমের খবর, খেয়ার সম্পাদকীয় দপ্তরে এসে পৌঁছয়নি তবু খবর পাওয়া গেছে কৃতী ছাত্র সংবর্ধনার অনুষ্ঠানটি কয়েক মাসের মধ্যেই সম্পন্ন হবে। 'খেয়া' অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র তাই এতে অ্যাসোসিয়েশনের প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তিগুলো যেমন থাকে তেমনি নানান বিষয়ের ওপর ছোট ছোট লেখাও প্রকাশ করা হয়।

প্রাক্তনীরা শিল্প সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে ছোট লেখা স্পষ্ট অক্ষরে লিখে দপ্তরে পাঠিয়ে দিন।

অ্যাসোসিয়েশন সম্বন্ধে প্রাক্তনীদের সুচিন্তিত মতামত সব সময়েই কাম্য।

আজীবন সদস্যপদের জন্য অনুরোধ ঃ

জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের সহৃদয় সাধারণ সদস্যদের প্রতি -

জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের সঙ্গে আমাদের আত্মিক সম্পর্ক। জীবনের প্রথম সকালে এর হাত ধরেই আমাদের পথ চলা। জীবনের আবর্তে অনেকটা পথ পেরিয়ে প্রাণের আরামে মনের আনন্দে আমরা আজ অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য।

সদস্যদের অনেকেই এখনও সাধারণ (বার্ষিক চাঁদা-র বিনিময়ে) সদস্য হিসাবে রয়ে গেছেন। আর সত্যি বলতে কি নানান কারণে বিশেষত ব্যস্ততায় স্কুলে এসে প্রতি বছর টাকা দিয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। লজ্জাকরভাবে বাকি থেকে যায় অ্যালমনি-র চাঁদা। তাই আপনাদের সাধারণ সদস্যদের (পরিচালন সমিতির সম্মতিতে প্রদেয় বাকি বার্ষিক পড়ে থাকা চাঁদা-র পরিবর্তে) মাত্র ৫০০ টাকা দিয়ে আজীবন সদস্য পদে উন্নীত হতে বিশেষ করে অনুরোধ করছি। আর আপনারা হয়ত জানেন যে আজীবন সদস্যপদের টাকা অ্যালমনি-র স্থায়ী আমানতে জমা থাকে। সুতরাং প্রাক্তনীদের নানান উন্নয়ন মূলক কাজে বিশেষ সহায়ক হতে আপনার অনুভব একান্ত দরকার।

চলে গেলেন কুণাল দাশগুপ্ত

জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের প্রাক্তন ছাত্র শ্রদ্ধেয় কুণাল দাশগুপ্ত চলে গেলেন। উনি ১৯৬৬-র ব্যাচ ছিলেন। ওঁনার মৃত্যুতে বালিগঞ্জ অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে গভীর শোকজ্ঞাপন করছি। ওঁর পরিবারবর্গের প্রতি রইল আমাদের সমবেদনা।

খেয়া

সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে আমাদের website-এ Alumni>Member list-এ গিয়ে আপনার Dataটা দেখুন। সেখানে তথ্যগত ত্রুটি থাকলে বা সংযোজন, পরিবর্তন থাকলে তা আমাদের website-এ feedback বা jbi.alumni.1914@gmail.com-এ মেল করে জানান। বিশেষ করে যাঁদের email ID আমাদের তথ্যভান্ডারে নেই।

এই সংখ্যাটি সন্দীপ চক্রবর্তী ১৯৯১ এর সৌজন্যে মুদ্রিত।

প্রসঙ্গ মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

(মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন জগদ্বন্ধু রায়ের বিশেষ বন্ধু। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যাপারে তিনি জগদ্বন্ধু রায়কে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন।

জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন এখন ২৫ নং ফার্ন রোডের গৃহে অবস্থিত। এই স্থানটি ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট দেয় এবং বিদ্যালয়ের পুরনো গৃহটিও তারা নির্মাণ করে। পূর্বতন বিদ্যালয় গৃহও স্থানটির বিনিময়ে, যেগুলি জগদ্বন্ধু রায়ের দান করা ছিল। এক্ষেত্রে তৎকালীন বিদ্যালয়ের সম্পাদক মুরলীধর সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। পুরনো তথ্যাবলী থেকে তাঁর সম্বন্ধে খানিকটা তথ্য এখানে তুলে দেওয়া হল।)

(১)

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল (বাংলা ১১ই বৈশাখ, ১২৭২) হাবড়া থানার অন্তর্ভুক্ত খাঁটুরা গ্রামে মুরলীধর জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম কুশদ্বীপ বা কুশদহের অন্তর্গত। কুশদ্বীপের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। এ অঞ্চলের একটা চিহ্নিত সীমান্ত বর্তমানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে নবদ্বীপের রাজ্যের পূর্বভাগকে কুশদ্বীপ বা কুশদীপ বলা হত। কুশদীপ ছিল নবদ্বীপ রাজাদের অধিকৃত অঞ্চল। সম্ভবত ত্রয়োদশ কি চতুর্দশ শতাব্দীতে এখানে বসতি গড়ে ওঠে। যে কয়েকখানি গ্রাম কুশদ্বীপ সমাজের অন্তর্গত বলে উল্লেখ করা হয় তাদের নাম — ইছাপুর, খাঁটুয়া, হয়দাদপুর, গোবরডাঙা, গৈপুর, শ্রীপুর, মাটিকোমরা, নাইগাছি, বালিটী, জলেশ্বর, যোধপুর, বেড়ী ও রামনগর। যমুনা কুশদ্বীপের একমাত্র নদী। তা ছাড়া এর চারিদিকে অসংখ্য বামোড়, খাল, বিল ও নালার পাশাপাশি ঘন বাঁশঝাড় ছিল। অনেক আগে কুশদ্বীপে খনন করে কয়েকটি মন্দিরের ভিত্তি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তারপর আর কোনরূপ খনন কাজ সেখানে হয়নি। এক সময়ে এখানে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল বলে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন।

মুরলীধর দক্ষিণ কলিকাতার বালিগঞ্জের ফার্ণ রোডে বাসকরতেন। বালিগঞ্জের সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন। এই অঞ্চলের প্রথম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিউশন ১৯১৪খ্রীষ্টাব্দে যাঁরা গড়ে তোলেন তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সম্পাদকরূপে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তারপর ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদক হন। তাছাড়া বালিগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের মুরলীধর ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। তিনি এ অঞ্চলের অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়েরও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ''নারী সমুন্নতি সমিতি'' ও ''ম্যালেরিয়া নিবারণ সমিতি'' তাঁর পরিশ্রমে গঠিত হয়। তিনি এ সমস্ত জনহিতকর প্রতিষ্ঠান রক্ষা করা ও এর উন্নতির জন্য নিজের অমূল্য সময় ব্যয় ছাড়াও, এর জন্য অর্থের অভাব হলে ঋণগ্রহণ করেও এই প্রতিষ্ঠানের বাকি কাজ সম্পূর্ণ করেছেন।

মুরলীধরের কথা বলতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে তাঁর পত্নী রাজবালাা দেবীর কথা মনে আসে। তিনি ছিলেন জোড়াসাঁকোর চাষা ধোপা পাড়া লেন নিবাসী রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা। রাজবালা দেবীর সঙ্গে মুরলীধরের বিবাহ একেবারেই হঠাৎ হয়। তখন রাজবালা দেবী ৭ বছরের শিশু ছিলেন। তিনি বাংলা ভালো জানতেন, ইংরাজীও কিছু কিছু শিখেছিলেন। হৃদয়বতী মহিলারূপে তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি ছিলেন চৌদ্দটি সন্তানের জননী। অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে তিনি এই বিরাট পরিবারের দায়িত্ব পালন করেন। অনেক সন্তান তাঁকে লালনপালন করতে হয় বলে তিনি ধাত্রীবিদ্যা শিখেছিলেন। কেবলমাত্র পরিবারের প্রয়োজনেই তিনি ধাত্রীবিদ্যার ব্যবহার করেননি। পাড়াপ্রতিবেশীর অসুখে-বিসুখেও তাদের তিনি দেখাশুনা করতেন। প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা গরীব ছিল তাদের সঙ্গেও রাজবালা দেবীর ভালো সম্পর্ক ছিল। ফার্ণ রোডে তখন কয়েক ঘর মুসলমান পরিবার ছিল। একটি দরগাও ছিল। সেখানে হিন্দুরাও যেত। এ অঞ্চলে তখন হিন্দু-মুসলিম কোনও সমস্যা ছিল না। সমাজসেবা ছিল রাজবালা দেবীর প্রধান ব্রত। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকের প্রয়োজনে তিনি তাদের বাড়ী যেতেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। তিনি কিরূপ কর্তব্যপরায়ণ ও হৃদয়বতী ছিলেন তার পরিচয় একটা ঘটনা থেকে পাওয়া যায়। রাজবালা দেবীর কনিষ্ঠ ছেলে জ্ঞানময় মৃত্যুশয্যায় রয়েছে। গভীর রাতে পুত্রের শুশ্রূষা যখন তিনি করছিলেন তখন তাঁর এক প্রতিবেশী ভীষণ বিপদে পড়ে তাঁকে ডাকতে আসেন। সেইরাত্রেই মৃত্যুপথযাত্রী পুত্রকে রেখে রাজবালা দেবী তাকে সাহায্য করতে যান। তার পরের দিন জ্ঞানময়ের মৃত্যু হয়।

সত্যনিষ্ঠা ছিল মুরলীধরের প্রধান কাজ। একটা ঘটনা থেকেই তা বোঝা যাবে। এক সময়ে নিয়ম ছিল ষোল বছর পূর্ণ না হলে কেউ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে পারত না। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এই পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেলেন তখন দেখা গেল তাঁর বয়স কম পড়ে গেছে। স্বভাবতই তাঁর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। শিক্ষকমহাশয়েরা তাঁর প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ ছিলেন। তাঁরা গিয়ে মুরলীধরকে বললেন, তিনি যদি একটা ভিন্ন জন্ম তারিখ দিয়ে আদালতে শপথ গ্রহণ করেন তাহলে হিরন্ময় পরীক্ষা দিতে পারে। কিন্তু মুরলীধর যা বললেন তাতে তাঁরা আর কোন জবাব দিতে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন, ''সে ত হয় না। জীবনটা আরম্ভ করবে একটা মিথ্যার উপর। সেটা কি ভাল? সুতরাং সেবার আর তিনি বসতে পারেন নি। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

মুরলীধর খুবই কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। তিনি পুত্রদের পূর্ণাঙ্গ মানুষ করে গড়ে তুলবার অভিপ্রায়ে জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সঙ্গে শরীর ও চরিত্র গঠনের দিকে নজর দেন। তিনি নৈতিক শিক্ষার জন্য উপনিষদ্ থেকে তাদের পাঠ করে শুনাতেন। বিদ্যাসাগর, বুদ্ধদেব প্রভৃতি মনীষীদের জীবনী তাদের পড়তে বলতেন। মেয়েদেরও শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা করেন। সন্ধ্যায় নিজেই তাঁদের পড়াতেন। শিক্ষাটা যাতে এক ঘেয়ে না হতে পারে এই কারণে জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের চিত্রবিদ্যা ও সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষারও ব্যবস্থা

করেন। ছেলেমেয়েরা উদ্দেশ্যবিহীন জীবনযাপন করুক তা তিনি চাইতেন না। বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি যাতে আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এজন্য তাদের 'দুরাশা' নামক হাতে লেখা মাসিক কাগজ প্রকাশ করতে উৎসাহিত করেন। কয়েক বছর 'দুরাশা' মুরলীধর পরিবারের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হয় এবং এই মাসিক পত্রের লেখক তাঁর ছেলেমেয়েরাই ছিলেন।

ছেলেমেয়েদের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে মুরলীধর সচেতন ছিলেন। বাল্যকালে শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় গৌতম বুদ্ধের মতবাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। তিনি যখন স্কুলের ছাত্র তখন জীবহত্যায় এতটা বেদনা অনুভব করতে থাকেন যে, বাড়ীতে এই নিয়ে মা ও অন্যান্যদের দুশ্চিন্তা শুরু হয়। তাঁকে মাছ মাংস খেতে বাধ্য করার চেষ্টাও চলে। এই অবস্থায় মুরলীধর পুত্রের স্বপক্ষে দাঁড়ান এবং নিজেও মাছ-মাংস ছেড়ে দেন। যদিও তিনি মাছ-মাংস খুবই পছন্দ করতেন, তখন থেকে মুরলীধর আর কখনও তা স্পর্শ করেন নি। পুত্রের শরীর রক্ষা করতে হবে। তাই কি খেলে তাঁর শরীর ভাল থাকবে, সেদিকে সব সময় তিনি লক্ষ্য রাখতেন। শ্রী হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিলাতে পড়াশুনার জন্য কয়েক বছর থাকেন তখন মুরলীধর তাঁকে কি কি খাওয়া দরকার তার তালিকা করে দেন। প্রায় প্রতি চিঠিতেই পুত্রের শরীরের ওজন জানতে চাইতেন। ব্যায়াম করছেন কিনা তার খবর নিতেন। শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বলেন, তাঁর পিতার খাদ্য-তালিকা অনুসরণ করেই তিনি সুস্থ ও সবল আছেন।

পারিবারিক জীবনে মুরলীধর একটানা অনাবিল শান্তি উপভোগ করতে পারেন নি। বিরাট পরিবারের বোঝা কেবলমাত্র পেন্সনের টাকায় চালান কষ্টকর ছিল। সময়ে সময়ে এত অসুবিধায় পড়েন যে, টাকার অভাবে অপমানিত পর্যন্ত হয়েছেন ; ধার পর্যন্ত কোথাও পাননি। তাঁর হাতে টাকা ছিল না বলে পুত্র জ্ঞানময়ের চিকিৎসাও ভালভাবে করতে পারেননি। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে হিরন্ময়ের কাছে লিখিত চিঠিতে বেদনার সঙ্গে এসব কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া মেজ ছেলেকে নিয়েও যথেষ্ট অশান্তি ভোগ করেন। মুরলীধরের অনেক দেনা ছিল। পিতার মৃত্যুর পর শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পত্তির এক্সিকিউটর হিসাবে ফার্ণ রোডের তিন বিঘা জমির এক বিঘা বিক্রি করে মুরলীধরের দেনা শোধ দেন। আর বাকী দু'বিঘা শোভাময় ও তেজোময় পান।

১৯২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত চিঠিতে জানা যায়, মুরলীধর তখন অন্যান্য কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কোন দিনই তিনি মেয়ে-স্কুল, স্বাস্থ্য-সমিতি ও অন্যান্য জনহিতকর কাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। এইসব কর্মে নানাপ্রকারে তাঁকে জড়িত থাকতে হয়।

খুব অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হলেও দীর্ঘ দিনের কঠোর পরিশ্রম আর তাঁর শরীর সহ্য করতে পারেনি। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। ডাক্তার ম্যালেরিয়া বলেই সন্দেহ করেন। লিভারের দোষও দেখা দেয়। তারপর তাঁর শরীর আর সুস্থ হয়নি। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই পত্নী রাজবালা দেবীর মৃত্যুর পর তাঁর শরীর একেবারেই ভেঙে পড়ে। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি সেপ্টিক ফিভারে আক্রান্ত হন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর কয়েকদিন রোগ ভোগের পর মুরলীধর পরলোক গমন করেন।

'হকি' খেলোয়াড় রঞ্জন চন্দ্র

স্বপন রায়চৌধুরী (১৯৫৩)

পূর্ববর্তী সংখ্যায় জগদ্বন্ধু বিদ্যায়তনের প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় ডি. চন্দ্রকে নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এবার ডি. চন্দ্রের কৃতী পুত্র খ্যাতনামা হকি খেলোয়াড় রঞ্জন চন্দ্রকে নিয়ে আজকের লেখা। জানা যায় সুহাসবাবু যখন এই বিদ্যালয়ের ক্রীড়াশিক্ষক তখন জগদ্বন্ধু স্কুলের হকি টিম কলকাতার এক সেরা স্কুল টিম। পরপর ৮ বছর হকিতে স্কুল চ্যাম্পিয়ন ছিল আমাদের স্কুল। ১৯৯০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ রঞ্জন চন্দ্র এই স্বর্ণযুগেরই খেলোয়াড়। রঞ্জন প্রায় সব খেলায় পারদর্শী ছিল। শুধু হকি নয়, ফুটবল ও ক্রিকেট খেলাতেও ছিল সুদক্ষ। স্কুলের অনেক কৃতী ফুটবল, হকি ও ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিল। হকি খেলোয়াড় শিবাজী রায়, বাসু রায়চৌধুরী, ভানু রায়চৌধুরী, রঞ্জন মণ্ডল, ক্রিকেট খেলোয়াড় রাজা মুখার্জী, রানা মুখার্জী, পার্থ গোস্বামী, কল্যাণ চৌধুরী প্রমুখ প্রখ্যাত খেলোয়াড়ের সমাবেশ ছিল। রঞ্জন চন্দ্রের কলকাতার মাঠে হাতে খড়ি বালিগঞ্জ ইন্সটিটিউটে হকি খেলোয়াড় রূপে। তখন দ্বিতীয় ডিভিসন টিম ছিল বালিগঞ্জ ইন্সটিটিউট। দু'বছর বালিগঞ্জ ইন্সটিটিউটে খেলার পর প্রথম ডিভিসন টিম স্পোর্টিং ইউনিয়ন। তারপরের বছর এরিয়ান ক্লাবে, পরের বছর ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে। তিন বছর ইষ্টবেঙ্গলে খেলার পর কাস্টমস্ ক্লাবে যোগদান। এর মধ্যে দু'বছর ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে অধিনায়ক। সবশেষে এফ. সি. আই-তে যোগদান। চাকরী ও অধিনায়ক। তার সম-সাময়িক হকি খেলোয়াড় — যাদের নাম করতে হয়, যেমন — ছেত্রী, জেনিংস, শৈবাল মুখার্জী, ডিন প্রমুখ। ৯৮ সালে জুনিয়র বেঙ্গল টিমে ৯৯ ও ২০০০ সালে বাংলা টিমে প্রতিনিধিত্ব করা, সর্বভারতীয় এফ. সি. আই টুর্নামেন্টে দীর্ঘ ৪ বছর খেলেছে ও পরে চাকরী ছেড়ে দিয়ে পৈত্রিক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। হকি খেলায় ডিভেন্সিভ লাইনে রঞ্জন চন্দ্রকে অতিক্রম করা খুব শক্ত ছিল। অত্যন্ত বিনয়ী খেলোয়াড়ী মনোভাব সম্পন্ন আমাদের বিদ্যালয়ের এই সুদক্ষ হকি খেলোয়াড় কাঁকুলিয়া রোডে তার পৈত্রিক বাড়ীতে বাস করে। কয়েক বছর আগে পত্নী বিয়োগের পর সম্প্রতি মা প্রয়াত হয়েছেন। একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধূ নিয়ে রঞ্জন চন্দ্রের সংসার। বর্তমান হকি খেলার উন্নতিকল্পে হকি লাভার্স এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত। রঞ্জন চন্দ্রের একান্ত ইচ্ছা জগদ্বন্ধু স্কুলের বর্তমান ছাত্ররা আবার হকি ধরুক। আমি তাদের ট্রেনিং দিতে প্রস্তুত। আমরা চাই রঞ্জন চন্দ্রের ট্রেনিং-এ জগদ্বন্ধু স্কুল তার হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনুক।

মহাকাব্যের আকর হতে
মহাকাব্যে মামা-ভাগ্নে

(পূর্ব প্রকাশিতের পরবর্তী)

একার লিস্টি খুব ছোটো হলেও, ভীষ্ম অবশ্যই সেখানে অপর একইজন dominant চরিত্র। ভীষ্ম-র একাকীত্বটা অনেকটাই আধুনিক এব, passoinate। সংসারের মধ্যে সন্ন্যাসী হয়ে অবস্থান করার মধ্যে এবং নিজের অকৃতদারত্বকে glorifying করার মধ্যে মহানুভবতার পাশাপাশি একটা বিরহীর শ্লাঘাও কিন্তু ফুটে ওঠে। কারণ, যদি তিনি পিতৃ বিবাহের শর্তপূরণ হেতু স্বেচ্ছায় স্বার্থত্যাগ করে থাকেন, তাহলে সেই ত্যাগকে আজীবন ওই 'ভীষ্ম' উপাধির মধ্যে তাঁর বয়ে বেড়ানোর কী দরকার ছিল? ওই উপাধি ছাড়া স্বনাম 'দেবব্রত'তে পরিচিত হলে কী তাঁর স্বার্থত্যাগের মহিমা কিছু কমে যেত? তাই ভীষ্মর একাকীত্বটা একলব্যের মতো ফার্স্ট বয় সুলভ নয়; সিনেমার 'বিরোহী' নায়কের মতো সে যথেষ্ট আধুনিক এবং অবশ্যই উঁচুদরের সাহিত্যকীর্তি হিসাবে গ্রহণযোগ্যও বটে। রামায়ণ তার প্রাচীনতার নুব্জতার 'একা' কাউকেই প্রায় করতে পারেনি। সূর্পনখা একা এসেছিল বটে রাম-লক্ষ্মণের প্রণয় প্রার্থনা করতে, কিন্তু সে প্রত্যাঘাত ও অপমানিত হয়ে ফেরার পর রাম-লক্ষ্মণকে মারতে ছুটে এল তার দুই তুতোভাই খর আর দূষণ। আবার মৃত্যু পথযাত্রী 'জটায়ু' একাকী বৃক্ষতলে পড়ে থাকলেও শেষপর্যন্ত দশরথের এই বাল্যবন্ধুর (একমাত্র রামায়ণে উল্লিখিত কোনোরকম আঁতাত ছাড়াই 'সখা'!) মৃত্যুর পরও আর 'একাকীত্ব' সইল না, কাহিনির বিন্যাসে আমরা হনুমান কর্তৃক সীতা অনুসন্ধান পর্বে তার ভাই সম্পাতিকে খুঁজে পেলাম। একমাত্র পরোক্ষভাবে হলেও 'সীতার পাতাল প্রবেশ' আর 'অহল্যা-র উপাখ্যানে' দু'জন নারীর একাকীত্ব ও অসহায়তা কিছুটা হলেও ফুটে ওঠে; তবে তার মধ্যে 'একা' ব্যাপারটা মোটেও সোচ্চার নয়, সেটা অনেকটাই অনুচ্চারের সঙ্গে বিলীয়মান হয়ে যেতে বাধ্য হয়। হনুমান একাই প্রথম সাগর লাফিয়ে লঙ্কায় পৌঁছতে পেরেছিল, কিম্বা মহাভারতের বনপর্বে অর্জুন একাই বিশ্বপরিভ্রমণে বের হয়েছিল, এগুলোকে ঠিক একাকীত্বের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। এগুলোর মধ্যে ওই চরিত্র দুটির ব্যক্তিত্বতেই Glorify করা হয় কেবল...

সম্পর্ক বিন্যাসে একাকীত্ব'র পরই আসে বহুত্বের তত্ত্ব। যেখানে 'দল' বা 'গোষ্ঠী'র মতো collective noun-এর কথাই আমি বলতে চাইছি। 'জুটি'-'ট্রায়ো'র মতো 'টিম'-ও কিন্তু কম বিখ্যাত নয়। হেমন্ত-মান্না যেমন জুটি, শাহরুখ-সলমন- আমির যেমন ট্রায়ো, তেমনই কিন্তু 'ইন্ডিয়া' একটা টিম। হাতের পাঁচ আঙুলের মতো সেখানে দৈর্ঘ্যের বাড়তি-কমতি থাকতে পারে, কিন্তু 'ইন্ডিয়া' বললে কখনোই ধোনি কিম্বা কোহলি-কে একা বোঝায় না। তেমনই নকুল আর সহদেব যতই যমজভাই হোক না কেন, 'পাণ্ডব' - এই পাঁচ ভাই-এর টিমের বাইরে তাদের জোড়া-অস্তিত্ব প্রায় দুর্লভ। 'পাণ্ডব'দের পাঁচ ভাই এক সাথ, এই concept-টা সেই 'জতুগৃহ ধ্বংস' থেকে 'মহাপ্রস্থান' পর্যন্ত বারবার মহাভারতে উঠে এসেছে। এমনকী দ্রৌপদীর পাঁচ স্বামীতে বিভাজনটাও তারই একটা চূড়ান্ত নিদর্শন যেন। যুধিষ্ঠিরের পাশার দানের যৌতুক কিম্বা যখ-র প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির কর্তৃক বাকি চার ভাই-এর জীবনলাভ, বিরাট সভায় অজ্ঞাতপর্বে দ্রৌপদী সহ পাঁচভাই-এর ছদ্মবেশ ধারণ - সবক্ষেত্রেই সেই 'টিম-বণ্ডিং'-এর নিদর্শনই চোখে পড়ে। 'পাণ্ডব' এবং 'কৌরব' এই দুটো বহুত্বযুক্ত টিম-এর যুযুধানের পিলারের উপরই কিন্তু মহাভারতের কাহিনি কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে কৌরব বলতে দুর্যোধন আর দুঃশাসনের পর সবই প্রায় ধোঁয়াশা যদিও, তবুও 'কৌরব শিবির' -এমনটাই বারবার উল্লিখিত হয়েছে মহাকাব্যে। 'কৌরব' বা 'পাঞ্চাল' - এই শব্দগুলো যদিও ব্যুৎপত্তিগতভাবে একটা বংশ বা clan কেই বোঝায়, তবুও মহাভারতের মূল অখ্যানে 'কৌরব'-এই শব্দের তাৎপর্যটা যেন কুরুর বংশ-র থেকেও বেশী দুর্যোধন ও তার দলবলকেই নির্দেশ করে। দশরথের চারপুত্র - রামায়ণেও বারবার এমনটাই ঝঙ্কৃত হতে দেখা যায়। রাবণের দশমুণ্ডও যেন দশজন ভীষণদর্শন যোদ্ধার একত্র একটা ব্যূহকেই বোঝানোর চেষ্টা করে। আর 'ব্যূহ' কথাটা যখন উঠেই পড়ল তখন 'চক্রব্যূহ'-র উল্লেখ তো করতেই হবে। চক্রব্যূহে অভিমন্যুর হত্যা এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সেই কিশোর যোদ্ধার অপরিসীম বিক্রমের কথা যতই আলোচিত হোক, অন্য perspective থেকে দেখলে, চক্রব্যূহ রচনাটাই কিন্তু একটা চূড়ান্ত টিম ওয়ার্কের ফলাফল। দ্রোণ সহ এই যে সাতজন রথী-মহারথীর একটা প্রবল টিম-ওয়ার্কের সামনেই তরুণ তুর্কি অভিমন্যু পরাভূত হল, এটা কিন্তু ওই 'among-bonding-টারই অপর একটা উদাহরণ। রামায়ণ-মহাভারতে যুদ্ধ বর্ণনা আছে বলেই রথী-মহারথীদের সঙ্গে শত-সহস্র সৈন্য সংখ্যা যুক্ত করা হয়েছে; সেটাকে আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনছি না। কিন্তু রামায়ণে 'বানর সেনা' ; এই কথাটা বারংবার উল্লিখিত হওয়ায় মনে হয়, এই দলটা খুব বড়ো কোনো সৈন্যসংখ্যার মতো স্ট্র্যাটেজিক কোনো গোষ্ঠী নয়; এরা অনেকটাই 'band of brothers'-এর মতো একদল বানর; যারা যুদ্ধের সময় যুদ্ধ করে, আবার প্রয়োজনে ব্রিজ কনস্ট্রাকশনের (সেতুবন্ধন) লেবার হিসাবেও কাজ করতে পারে! এমন ইউনিকনেশ কিন্তু 'রাক্ষস সেনা' (রাবনের) বা 'নারায়ণী' সেনার (কৃষ্ণর) মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না।

(ক্রমশ)

অঙ্কন মিত্র (২০০২) e-mail : ekomitter@gmail.com

facebook -এ status- দেওয়া বা
twitter- এ ট্যুইট করা তো রইলই, কিন্তু
ছাপাখানার বিকল্প কী ?
প্রিন্ট গ্যালারি
১৮৯এফ/২, কসবা রোড, কলকাতা - ৪২,
ফোন ঃ ৮৯৮১৭৫২১০০

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.